পার্বত্য চট্টগ্রামে কৃষির রূপান্তর-১

পাহাড়ে নীরব বিপ্লব কৃষিতে

বর্তমানে এসব এলাকায় আম, আনারস, কাঁঠাল, কলা, ড্রাগন ফল, পেঁপে, কমলা, মাল্টা, কাজুবাদাম, কফি, হলুদ, আদা, মাশরুমসহ বিভিন্ন ফল ও ফসল উৎপাদিত হচ্ছে।

প্রকাশ : বুধবার ১৬ জুলাই ২০২৫, ০২:৩৭
মুদ্রিত সংস্করণ

Copy link

এক সময়ের অবহেলিত ও অনাবাদি পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন কৃষির উর্বরভূমি। ফলমূল, মসলা, তেলবীজ এমনকি উচ্চমূল্যের অপ্রচলিত ফসল চাষে বছরে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার উৎপাদন হয় তিন পার্বত্য জেলায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সঠিক পরিকল্পনা ও প্রযুক্তির ব্যবহার অব্যাহত থাকলে আগামী পাঁচ বছরে এই পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে।

বর্তমানে পাহাড়ি এলাকায় চলছে এক 'নীরব কৃষি বিপ্লব'। কৃষির আধুনিকীকরণ, সরকারি-বেসরকারি সহায়তা, কৃষকদের আগ্রহ, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উচ্চমূল্যের ফসল চাষে সাফল্যের মাধ্যমে পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে কৃষির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে জমি কম হলেও কৃষি উৎপাদনে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর ও স্থানীয় প্রশাসনের তথ্য বলছে, বর্তমানে এসব এলাকায় আম, আনারস, কাঁঠাল, কলা, ড্রাগন ফল, পেঁপে, কমলা, মাল্টা, কাজুবাদাম, কফি, হলুদ, আদা, মাশরুমসহ বিভিন্ন ফল ও ফসল উৎপাদিত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বান্দরবান জেলাতেই প্রতি বছর প্রায় ২.৫ লাখ টন ফল উৎপাদিত হচ্ছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ৮৫০০ কোটি টাকা। তিন পার্বত্য জেলায় গত অর্থবছরে বিক্রি হওয়া ফলমূলের বাজারমূল্য ছিল ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি, যা এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। খাগড়াছড়ির কৃষি কর্মকর্তারা জানান, শুধুমাত্র আম চাষ থেকেই জেলায় প্রতি বছর ৫০০ কোটি টাকার বেশি আয় হয়। তিন হাজার ২৪৪ হেক্টর জমিতে আম, ১০ হাজার ৫১৫ মেট্রিক টন লিচু, চার হাজার ৫০০ হেক্টরে হলুদ এবং তিন হাজার হেক্টরে আদা চাষ হচ্ছে। আদার উৎপাদন প্রায় ৪০ হাজার মেট্রিক টন, যার বাজারমূল্য ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি টাকার মধ্যে।

বদলে গেছে চাষাবাদ পদ্ধতি : এক সময় এই অঞ্চলে প্রধানত জুম চাষ হতো, যা টিকে থাকার সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখন পাহাড়ের কৃষি আধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত জাতের বীজ ও সেচব্যবস্থায় অনেক বদলে গেছে। সোলার পাম্প, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ব্যবহার বাড়ছে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ছোঁয়ায় জুম চাষ এখন ঐতিহ্য হিসেবে টিকে আছে; তবে জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় আর নয়। প্রধানত প্রাকৃতিক ঝরনার পানির ওপর নির্ভরশীল এই অঞ্চলে এখন উন্নত সেচপদ্ধতি চালু হয়েছে। এতে শুষ্ক মৌসুমেও চাষাবাদ সম্ভব হচ্ছে। কৃষকরা এখন প্রায় সারা বছর ফসল ফলাতে পারছেন।

অনাবাদি জমিতেও চাষ শুরু : পাহাড়ে এক সময় হাজার হাজার একর জমি অনাবাদি পড়ে থাকত। তবে গত এক দশকে এই জমিতে কাজুবাদাম, কফি, লেবু, রাম্বুটান, সফেদা, ড্রাগন ফল, মাল্টার মতো উচ্চমূল্যের ফল চাষ শুরু হয়েছে। কৃষিবিদদের মতে, এখনো যে জমিগুলো অনাবাদি রয়েছে, সেগুলো কাজে লাগানো গেলে কাজু ও কফি থেকেই বছরে প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা আয় সম্ভব। এক সময়ের 'কার্পাস মহল' নামে পরিচিত এই অঞ্চল কার্পাস তুলা ও তেলবীজ চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখন সেই ঐতিহাসিক পরিচয়ের জায়গায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি জায়গা করে নিয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শুধু দেশের খাদ্যনিরাপত্তায় ভূমিকা রাখছে না, বরং এটি রফতানিমুখী কৃষি অর্থনীতিরও

জীবিকা ছিল। জমি পরিষ্কার করে আগুন দিয়ে জঙ্গল পুড়িয়ে ফসল চাষ করাই ছিল চিরাচরিত প্রথা। তবে এতে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তো এবং ফসলের উৎপাদনও কম হতো। এখন কৃষকরা ধীরে ধীরে জুম চাষ থেকে সরে এসে পরিকল্পিত ও টেকসই কৃষিব্যবস্থায় অভ্যস্ত হচ্ছেন।

উচ্চমূল্য ফসল চাষে সম্ভাবনার বিস্তার : চিরাচরিত ধান, ভুট্টা, শাকসবজির চেয়ে অধিক লাভজনক এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাসম্পন্ন ফসলের দিকে ঝুঁকছেন পাহাড়ি কৃষকরা। বর্তমানে ড্রাগন ফল, স্ট্রবেরি, কমলা, মাল্টা, গোলমরিচ, আদা, হলুদ, এলাচ, কফি, তুলসী পাতা, কালোজিরা ও চা গাছ চাষ হচ্ছে। বিশেষ করে রাঙ্গামাটির কাউখালী, বান্দরবানের থানচি ও খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়িতে ড্রাগন ফল ও গোলমরিচের চাষ বাণিজ্যিকভাবে হচ্ছে। শুধু স্থানীয় বাজার নয়, এসব ফল ও মসলার একটি অংশ এখন রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বড় শহরে সরবরাহ হচ্ছে।

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাওয়া জীবনচিত্র : আগে পাহাড়ি কৃষকরা মূলত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চাষ করতেন, কিন্তু এখন তাদের পাশে আছেন কৃষি কর্মকর্তারা, উন্নয়ন সংস্থা ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। সৌরচালিত সেচপাম্প, মালচিং পদ্ধতি, অর্গানিক সার, ড্রিপ সেচ প্রযুক্তি, ফলসংরক্ষণের ঠাণ্ডা ঘর (কোল্ড স্টোরেজ) এবং মোবাইল অ্যাপভিত্তিক কৃষিসহায়তার মাধ্যমে কৃষকরা এখন অনেক বেশি সচেতন ও দক্ষ।

খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় বসানো হয়েছে ৪০টি সৌরসেচ পাম্প, যা প্রায় ২০০ একর জমিকে সেচসুবিধা দিচ্ছে। এর ফলে খরা মৌসুমেও ফসল চাষ সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়া পাহাড়ের ঢালু জমিতে ধাপে ধাপে বাঁধ দিয়ে টেরেস ফার্মিং চালু হয়েছে, যা মাটির ক্ষয় রোধের পাশাপাশি ফলনও বাড়াচ্ছে।

কৃষিতে বৈচিত্র্য আনতে এবং আয়ের নতুন পথ খুলতে পাহাড়ি অঞ্চলে চাষ হচ্ছে কফি ও কাজুবাদাম। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের ‘কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে কাজুবাদাম ও কফি। প্রকল্পের শুরুর দিকে যেখানে দেশে কাজুবাদামের চাষ হতো মাত্র এক হাজার ৮০০ হেক্টরে, সেখানে এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার হাজার ২০০ হেক্টরে। কফির ক্ষেত্রেও একই চিত্র মাত্র ৬৫ হেক্টর থেকে বেড়ে এক হাজার ৮০০ হেক্টর জমিতে ছড়িয়ে পড়েছে কফি চাষ।

কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরিচালক শহীদুল ইসলাম নয়া দিগন্তকে বলেন, পাহাড়ি অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ু এ দুই ফসলের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ হুমকিতে না ফেলে দীর্ঘ মেয়াদে লাভজনক ফসল চাষ সম্ভব হচ্ছে। দেশে এখন প্রায় দুই লাখ হেক্টর অনাবাদি পাহাড়ি জমি আছে, যা কাজুবাদাম ও কফির চাষে ব্যবহার করা সম্ভব। এই জমি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে দেশ শুধু অভ্যন্তরীণ চাহিদাই পূরণ করবে না, বরং এ দুই ফসল রফতানির মাধ্যমে অর্জন করতে পারবে বৈদেশিক মুদ্রা। চাষ যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে উদ্যোক্তা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে ২২টি কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, যার সবই বেসরকারি উদ্যোগে। এর ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণ সহজ হয়েছে।

জানাই। কৃষকরা মসলা চাষে অধিক লাভের বিষয়টি বুঝ... তারা মসলা চাষে এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন। তা ছাড়া কৃষকদের চারা রোপণ করা, জৈব সার ব্যবহারসহ মসলা চাষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা কৃষকদের মাঠ পর্যায়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়েছি।

বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষ করে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরেছে পাহাড়ের অনেক পরিবারে। ঔষধি ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার হিসেবে মাশরুম এই অঞ্চলের মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চাহিদা থাকায় স্বল্প খরচে লাভজনক মাশরুম চাষে ঝুঁকছেন পাহাড়ের নারীরাও। মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (পিডি) ড. মোছা: আখতার জাহান কাঁকন নয়া দিগন্তকে বলেন, খাদ্যাভ্যাসে আছে, আলাদা করে রন্ধন প্রণালী প্রয়োজন নেই, সবকিছুতেই মাশরুম খায়, মার্কেট আছে, আবহাওয়া ও বিভিন্ন ধরনের মাশরুম উৎপাদনের জন্য উপযোগী। কিন্তু পাহাড়িরা নিজে উৎপাদন করে খাওয়ার তুলনায় প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট মাশরুম বেশি খেয়ে থাকেন।

বান্দরবান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপপরিচালক এম এম শাহ্ নেয়াজ নয়া দিগন্তকে বলেন, ‘আমরা স্থানীয় জনগণের ঐতিহ্য রক্ষা করেই আধুনিক কৃষির সাথে তাদের সম্পৃক্ত করছি। কেবল উৎপাদন নয়, পরিবেশ, খাদ্যনিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়গুলোও গুরুত্ব পাচ্ছে।’

সামনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় : পাহাড়ি কৃষির এই অগ্রযাত্রা সত্ত্বেও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। মাটির ক্ষয়, বৃষ্টির অনিয়মিততা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, রাসায়নিক সারের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং বাজারব্যবস্থায় দালালচক্র এখনো সমস্যা তৈরি করছে।

পাহাড়ি অঞ্চলের কৃষিতে যে নীরব বিপ্লব ঘটেছে, তা দেশের কৃষি খাতের জন্য এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এই পরিবর্তন কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং সামাজিক ও পরিবেশগতভাবেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেছে, পরিবহন ও বাজারব্যবস্থা উন্নত হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, একটি পিছিয়ে থাকা অঞ্চল এখন দেশের খাদ্যনিরাপত্তায় অবদান রাখতে পারছে। যদি এই গতিধারা অব্যাহত থাকে এবং চ্যালেঞ্জগুলো সঠিকভাবে মোকাবেলা করা যায়, তবে পাহাড়ি কৃষিই হতে পারে বাংলাদেশের আগামী দিনের অন্যতম কৃষি সম্ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুÑ এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিষয়সমূহ

বিশেষ প্রতিবেদন   কৃষি   পার্বত্য চট্টগ্রাম